বিমল রায়— টাইটান না টাইকুন!

সুগত সিংহ

যাঁদের কাজ গড়পড়তা হিসেবের বাইরে সেই সব মানুষকে নিয়ে আমাদের দুটি অ্যাটিচুড কাজ করে— স্মরণ অথবা বিস্মরণ। আমরা খুব ভাল ভাবতে পারি এবং ভাল তর্পণ করতে পারি। খুব ভাল উপেক্ষা করতে পারি আবার ভীষণ আপ্লুত হতে পারি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরেকটা উঠে আসে। যেমন সত্যজিৎ আর ঋত্বিককে নিয়ে হয়েছে। একদল এঁদের নিয়ে বিসদৃশ মাতামাতি করেন, কোনও ফোকরই দেখতে চান না। জবাবী ভাষণে আরেক দল প্রাপ্য আসনটুকু দিতে চান না। মৃণাল সেনের অবর্তমানে তাকে নিয়ে কী পরিমাণ ঢক্কাঢোল শুরু হবে তা এখন থেকেই আন্দাজ করা যায়। সেনটিমেনটালিটি, ফাঁকিবাজি এবং আত্মবিশ্বাস বা বিশ্বাসেরই অভাব থেকে এধরনের ঘোলাটেপনা তৈরি হয় যা একটি মানুষকে বোঝার প্রক্রিয়াকে গুলিয়ে দেয়। বিমল রায়ও এই আবর্তে পড়ে গেছেন। তাঁর ভাগ্যে তর্পণটুকু জোটেনি। অভিমানে আরেকদল তাঁকে টেনেটুনে একটা আসনে বসাতে চেয়েছেন।

বিমল রায়কে নিয়ে আলোচনায় আরেকটা দ্বিধা হল তাঁর অনেক ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। যে কটি পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে যেকটি দেখে উঠতে পেরেছি তার ভিত্তিতে কতগুলো ইঙ্গিত দেওয়া যায়, কোনও দাঁড়ি টানা যায় না। মূল কথায় ঢোকার আগে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য জরুরি। তাঁর জন্ম ১৯০৯ সালে, পূর্ববঙ্গের সুহাপুর গ্রামের এক জমিদার পরিবারে। মৃত্যু ১৯৬৬ সালে। অর্থাৎ তিনি সেই যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ যিনি পরাধীন ভারত দেখেছেন। যৌবনে তিনি কলকাতায় এসে নিউথিয়েটার্সে ঢোকেন প্রমথেশ বড়ুয়ার ইউনিটে ক্যামেরাম্যান হিসেবে। তিনি নীতিন বসুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান হন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ -এর মধ্যে ক্যামেরাম্যান এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান হিসেবে যেসব ছবিতে তিনি কাজ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেবদাস (হিন্দি), মীরা, গৃহদাহ, মুক্তি (হিন্দি), বড়দিদি (হিন্দি), অভিনেত্রী ইত্যাদি। ১৯৪৪ সালে নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে পরিচালনা করেন উদয়ের পথে। সে যুগের গতানুগতিক বাংলা ছবির থেকে অন্যরকমের হয়েও এছবি বাণিজ্যিকভাবে দারুণ সফল হয়েছিল। কারণ ছবিটির মধ্যে বাণিজ্যিক এবং অন্য উপাদান চতুরভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটি কী একটা কৌশল নাকি বাধ্যবাধকতা— তা আজ আর বলা যাবে না। কারণ এসব বলতে পারতেন যাঁরা তাঁরা নেই।

ছবির শুরুতেই দেখা যায় বিরাট ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা গোপা এবং একদম নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে সুমিত্রার বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়, তারা আত্মার আত্মীয়। তাদের যে কোথায় কীভাবে আলাপ তা ছবিতে বলা নেই। অনুপের সঙ্গে গোপার যোগাযোগ হয়েছিল তার বোন সুমিত্রার মাধ্যমে। সুমিত্রার সঙ্গে গোপা কথা বলে না। ঘটনাচক্রে ব্রজেন্দ্রনাথের ছেলে সৌরীন্দ্রনাথ, যে তাদের ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধারও বটে, অনুপকে তাদের কোম্পানিতে কপিরাইটিং -এর চাকরি দেয়। তার লেখার হাত ভাল বলে তাকে নিয়ে বিভিন্ন সভায় নিজের ভাষণের বয়ান লিখিয়ে হাততালি কুড়োতে থাকে। অনুপ আসলে সাহিত্যিক। তার লেখা একটি উপন্যাসের কোনও পাবলিশার পাওয়া যাচ্ছে না শুনে চাপানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সৌরীন সেটি নিয়ে নেয়। তারপর নিজের নামে বার করে দেয়। সমস্ত ঘটনাটি গোপা জানতে পেরে যান এরপর থেকেই গোপার সঙ্গে অনুপের সম্পর্কের বরফ গলতে থাকে। অনুপ শ্রমিক মহল্লায় নানারকম কাজ করে বেড়াত। গোপা তাকে সঙ্গ দিতে শুরু করে। শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার সম্বন্ধে অবহিত হয়। সৌরীন জানতে পারে অনুপের প্ররোচনায় বক্তৃতা চলছে তখন তার ওপর ইটপাটকেল পড়া শুরু হয়। সেই মুহূর্তে সেখানে এসে হাজির হয় গোপা। অনুপের সঙ্গে গোপার ছবি পরের দিন কাগজে বেরিয়ে যায়। মেয়ের এই কীর্তি ব্রজেন্দ্রনাথের পারিবারিক অভিজাত্যে কালিমা লেপে দেয়। অনুপের সঙ্গে আর দেখা করা চলবে না বাপ - দাদার এই অনুশাসন ভেঙে গোপা গিয়ে মিলিত হয় অনুপের সঙ্গে। ছবির শেষে তারা এগিয়ে চলে এক নতুন সূর্যের দিকে, উদয়ের পথে।

বড়লোকের মেয়ে নানা বাধাবিপত্তি এবং ভুল বোঝাবুঝি পেরিয়ে বাউণ্ডুলে কিন্তু নীতিনিষ্ঠ প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হল— এই গল্প হলিউড, বলিউড, টলিউড, সারা পৃথিবী জুড়ে বহুবার বলা হয়েছে। এটি একটি টাইম টেস্টেড ফরমুলা। বিমল রায়ের কৃতিত্ব হচ্ছে তার সঙ্গে শ্রমিকবঞ্চনার একটি প্রেক্ষাপট তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন। এইটুকুর জন্যই সে যুগের অন্যান্য ছবির ভিড়ে এ ছবি আলাদা করে চোখে পড়ে। নচেৎ ছবির আঙ্গিকে নানারকম অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে। যেমন সেট হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথের বাড়ি আসবাবপত্র যতটা বিশ্বাসযোগ্য অনুপের ঘর ততটা নয়। ঘরের মধ্যে দাঁত বের করে থাকা ইটের গাঁথনি সত্ত্বেও বোঝা যায় এটা সেটই। সম্ভবত সে সময়ের উচ্চবিত্ত সমাজ তাঁর যতটা নিবিড়ভাবে দেখা ছিল, নিম্নবিত্ত সমাজ ততটা নয়। বস্তির আউটডোর শটগুলি বরঞ্চ অনেক জীবন্ত। তবে দো বিঘা জমিন -এ পঞ্চাশের কলকাতাকে যতটা তীব্রভাবে পাই, চল্লিশের কলকাতা এ ছবিতে তেমনভাবে হাজির নয়। সংলাপেও দুটি ধাঁচ লক্ষ করা যায়। অনুপ এবং গোপার মধ্যে যে কথার মার পাঁচ চলতে থাকে সেটা একান্তভাবেই বই-এর ভাষা, মুখের ভাষা নয়। অপরদিকে বাড়িওলা বা সৌরেন্দ্র বা তাদের বাড়িতে যে চরিত্রগুলি আসা যাওয়া করেছে এমন কি বিভাসের ইংরেজি মেশানো সংলাপের ম্যানারিসমও বেশ বাস্তব লাগে, বিদেশী শিক্ষার গর্ভস্রাব হিসেবে জাত এক শ্রেণির ভুঁইফোড় বাঙালিকে চিনিয়ে দেয়। সংলাপ যত বাস্তব হয় অভিনয়ও তত স্বাভাবিক হয়। এধরনের সংলাপের চাপে পড়ে গিয়ে রাধামোহন ভট্টাচার্য (অনুপ) আর বিনতা রায়ের (গোপা) অভিনয় বেশ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষত বিনতার বাচনে সবসময়ে একটা সুর ধরা পড়েছে যেটা বেশ কানে লাগে। অপরদিকে বাড়িওলার ভূমিকায় একদম কথ্যভাষা পেরিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা রোলে তুলসী চক্রবর্তী ফুল ফুটিয়ে ছেড়েছেন। বাড়িভাড়ার টাকা না পেলেই তাঁর সারা শরীর জুড়ে যে বিরক্তি প্রকাশ পায়, তাঁর যে বডি ল্যাংগুয়েজ, কথার ফাঁকে ফাঁকে চোখ মুখ নাকের যে ছোট ছোট কুঞ্চন, তা যেন তাঁর সামগ্রিক অ্যাকটিং স্কিমের মধ্যে, একটা সামগ্রিক সুরবিস্তারের মধ্যে ছোট ছোট গিরগিটির মতো খেলে যায়। উদয়ের পথের কথা মনে পড়লেই ওঁর কথা একবার মনে পড়ে এবং নিজের অজান্তে একটু হাসি পায়। সে তুলনায় মূল চরিত্রদুটি বড্ড থিয়েট্রিকাল। থিয়েট্রিকালই বা বলি কি করে? বাংলা থিয়েটারের সংলাপে তো দুটো ধারা ছিল। একটা বাস্তবমুখী মেঠো সংলাপের ধারা যেটা দীনবন্ধু মিত্র এবং মাইকেলের বুড়ো শালিকের

ঘাড়ে রোঁ বা একেই কি বলে সভ্যতার সময় থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে নাটকে গাল মন্দ খিস্তিখেউর অবলীলায় জায়গা করে নিয়ে অদ্ভুত জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। আরেকটা ধারা পরিণতি পেয়েছিল রবীন্দ্রনাটকের পরিশীলিত জটিল তির্যক রূপকধর্মী বাক্যবন্ধে। রবীন্দ্রধর্মী নাটকে সেটা খাপ খেয়ে যায় কারণ সেটা বিষয়গতভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট। এই দুটি ধারার একটা ঠোকাঠুকি উদয়ের পথেতে চোখে পড়ে। পার্শ্বচরিত্রগুলি সব স্বাভাবিক ভাষায় কথা বলছে মূল চরিত্রদুটি এক্সাজারেটেড বাচনভঙ্গি নিয়েছে। নাকি এই দুটি চরিত্র ছবির আর পাঁচটা চরিত্রর থেকে অনেক বেশি সংবেদনশীল, আলাদা— এটা প্রমাণ করতে এই ইচ্ছাকৃত এক্সাজারেশন করা হল। আসলে সিনেমাকে তখন একটি উন - মাধ্যম হিসেবে দেখা হত। চেষ্টা করা হত। চেষ্টা করা হত তাকে একটু সাহিত্যগন্ধী করে যদি জাতে তোলা যায়। যে কারণেই হোক ছবিতে তা জমাট বাঁধেনি।

উদয়ের পথে পর বিমল রায়ের সবচেয়ে সফল ছবি দো বিঘা জমিন। প্রথমটি কলকাতায় করা দ্বিতীয়টি বোম্বাইতে। মাঝে ন-বছরের ফাঁক। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির অভিনয়ে আকাশ - পাতাল পার্থক্য। জমিনের অভিনয় সত্যিই জমিনের কাছাকাছি। টালিগঞ্জের ছবিতে যে ধরনের সাহিত্যগন্ধী সংলাপ ও অভিনয়ের ধারা চালু হয়েছিল তা বাঙালির তথাকথিত সাহিত্যমুখী জাত্যাভিমানের সঙ্গে যুক্ত। বোম্বে চিরকালই কসমোপলিটান, হলিউডের মতো সেখানকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ গিয়ে মিশে গেছেন, নানা স্রোতের মিলনে কার কোনটা ভাল প্রতিমুহূর্তে পরীক্ষিত হয়েছে এবং যে কোনও ঘেরাটোপ এক লহমায় উড়ে গেছে। উদয়ের পথে এবং দো বিঘা জমিনের মাঝে আরও বেশ কয়েকটি ছবি তিনি তৈরি করেন যেমন অঞ্জনগড়, মন্ত্রমুগ্ধ, পহেলা আদমি, মা। এই সময়েই কি তাঁর ছবির অভিনয় রীতিতে এই পরিবর্তন আসছিল নাকি মুম্বই যাওয়ার পর এই মিশ্র পরিবেশে পড়ে তা পাল্টে যায়। এটা আজ হলপ করে বলা মুশকিল। কারণ দুঃখের বিষয় ওই ছবি কটি সব নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৫৩ সালে তিনি মুম্বইতে তিনি দুটি ছবি তৈরি করেন— দো বিঘা জমিন এবং পরিণীতা। শ্যাম বেনেগলের মতো দ্বিতীয়টি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি।[১] কিন্তু এটিও আর দেখতে পাওয়া যায় না।

দো বিঘা জমিন ছবিটির কাহিনি সলিল চৌধুরীর, প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমি। উত্তর ভারতের কোনও একটি গ্রামের একদল কৃষক খরা, বর্ষা, দৈনন্দিন সুখ - দুঃখ, চাষবাস নিয়ে দিব্যি জীবনধারণ করছিল। এদেরই একজন আমাদের ছবির নায়ক শম্ভু মাহাতো। জমিদার হরনাম সিং-এর চোখ পড়ল তার জমিটির দিকে। একদল শহুরে ইনভেস্টরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিনি সেখানে মিল করতে চান। যে দৃশ্যে হরনাম তার শহুরে অতিথিদের জমি দেখাতে নিয়ে আসে সেটি ডি সিকার মিরাকল ইন মিলানের একটি দৃশ্য মনে পড়িয়ে দেয়। শহরের প্রান্তে একদল মানুষ বস্তি তৈরি করে আছে। ঘটনাচক্রে সেখানেই তেল পাওয়া গেল। ব্যস বড় বড় লোকের যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। তারা গাড়ি করে ধুলো উড়িয়ে আসে, নেমে দেখে, নিজেদের মধ্যে নানারকম আলোচনা করে, যারা সেই জমির উপর বসে আছে তাদের সঙ্গে কথাও বলে না, তাদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। তারাও বুঝে উঠতে পারে না এরা কেন এসেছে শুধু বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। খেতি ছেড়ে উঠে এসে শম্ভুরা হরনাম সিং এর তার সাঙ্গপাঙ্গদের ওই চোখেই দেখতে থাকে। শম্ভু তার বাপঠাকুরদার জমি কিছুতেই ছাড়তে চায় না। হরনাম তাকে মিথ্যা ঋণের মামলায় জড়িয়ে দেয়। শুনানি হয় যে তিন মাসের মধ্যে তাকে দুশো পয়ত্রিশ টাকা দিতে হবে। নইলে জমি কেড়ে নেওয়া হবে। শম্ভু টাকা রোজগার করতে কলকাতায় আসে। বাবার অজান্তে তার বছর দশেকের ছেলে কানাইয়া ট্রেনে উঠে পড়ে। সাধারণত কারখানা বা মিলের জন্য দলে দলে লোক উৎখাত হয়। এখানে শুধু শম্ভুকেই গ্রাম ছাড়তে হয়। এটা তার পার্সোনাল ট্রাজেডি।

এরপর বাপ-ছেলে এসে নামে কলকাতায়। সাথে সাথে এমন কিছু শট আসতে থাকে যা ভারতীয় ছবিতে দুর্লভ ছিল। আমরা দেখি কলকাতার রাস্তাঘাট, গাড়ি, ঘোড়া, ট্রাম, গরু, হাওড়া ব্রিজ ইত্যাদির মধ্যে বাপ ছেলে একদম ভেবলে গেছে। এই অংশটি অবশ্যই ডি সিকার বাইসাইকেল থিভ দ্বারা ভ্রভাবিত। সেখানেও বাপ-ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে হারিয়ে যাওয়া সাইকেলের খোঁজে, এখানেও ঘুরতে ঘুরতে এদের টাকা পয়সা পুঁটুলি সব হারিয়ে যায়। তারা ময়দানে এসে আশ্রয় নেয়। দূরে দেখা যায় মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ব্রিটিশ স্ট্যাচু ইত্যাদি। ওই লিগাসির দায় যে এই বাপ - ছেলেকে বইতে হচ্চে অনুচ্চারভাবে সে কথা বলা হয়ে যায়। এই সাব্লিমিটি, এই প্রচ্ছন্নতা, এই মগ্ন - মন্তব্য ডি সিকার ঘরানা। বিমল রায় তা বলেও গেছেন— 'বহু প্রথম শ্রেণীর ফরাসি ও ইতালিয় চিত্র যেমন বাইসাইকেল থিভস, ওপেন সিটি, লা এঁ ফাঁদ দ্য পারাদি ইত্যাদি ছবিগুলির নজির দেখানো চলে যেগুলি বিচিত্র কাব্যিক সুষমায় মণ্ডিত হয়েও আঙ্গিক কারসাজির দিকে থেকে অনুল্লেখ্য।'[২] এরপর দুজনে আশ্রয় পায় এক বস্তিতে। গ্রাম এবং শহর দুটি পর্যায়েই দো বিঘা জমিনের সমস্যা হয় ইনডোরে, আউটডোরে নয়। শম্ভুর দেশের বাড়ি এবং শহরের বস্তিঘর কিন্তু সেটই মনে হতে থাকে। পকেটমার এবং জুতো পালিশ করে যে ছেলেটি তাদের মেকআপ ঢং ঢাং যতটা বাস্তব কানহাইয়া ততটা নয়। তার হাবভাব মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলের মতোই।

ওই বস্তির বাড়িউলি, তার মেয়ে, পাশের ঘরের বুড়ো এদের নানারকম সাহায্য করতে থাকতে। শম্ভু রিক্সা চালায়, কানাইয়া জুতো পালিশ করে। শম্ভু রিক্সা অ্যাক্রিডেন্টে জখম হয়। সে আর রিক্সা টানতে পারে না। উল্টে চিকিৎসা করতে গিয়ে যতটুকু টাকা তারা যোগাড় করতে পেরেছিল সব খরচা হয়ে যায়। দীর্ঘদিন কোনও চিঠি না পেয়ে শম্ভুর স্ত্রী শহরে আসে খুঁজতে। সেও দুর্ঘটনায় পড়ে। শেষ মেষ তারা মিলিত হতে পারে। ইতিমধ্যে তিনমাস কেটে গেছে, টাকা যোগাড় হয়নি। তারা গ্রামে ফিরে আসে। ততদিনে তাদের জমি বেহাত হয়ে গেছে। সেখানে মিল তৈরি হয়েছে। তারা জালের বেড়ায় ওপার থেকে দেখে যেখানে তাদের ঘর ছিল, সেখান থেকে এখন কালো চিমনির ধোঁয়া বেরোচ্ছে। শম্ভু শুধু তার বাপ - ঠাকুরদার জমি থেকে একমুঠো মাটি নিতে চেয়েছিল। চৌকিদার চোর বলে তাকে তাড়া করে। তারা এগিয়ে চলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উপেন নিজের হাতে পোঁতা আমগাছ থেকে দুটো আম নিতে চেয়েছিল। তাকেও দারোয়ান খেদিয়ে দিয়েছিল। বস্তিতে জায়গা পাওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিতে প্রচুর মেলোড্রামা আছে, যেটা ডি সিকাদের ঘরানার সঙ্গে মেলে না। অবশ্য সবাইকে যে একই ধাঁচে সব কিছু করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সমস্যাটা মেলোড্রামা নিয়ে নয়, সরলীকরণ নিয়ে। আসলে গ্রামের কৃষকসমাজ এবং শহরের নিম্নবিত্ত সমাজকে বিমল রায় দেখেছেন একটু দূর থেকে। সে দেখায় সততা, আন্তরিকতা ও সিমপ্যাথির অভাব নেই, অভাব আছে নৈকট্যের এখানে তিনি বহিরাগত। ফলে এটাই কি পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় লুমপেন সমাজের প্রকৃত চিত্র— এ প্রশ্ন থেকেই যায়। মধুমতীর (১৯৫৮) কাহিনি

ও চিত্রনাট্য ঋত্বিক ঘটকের। এটি একটি কাল্পনিক কাহিনি। দেবেন্দ্র স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছিল রেল স্টেশনে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে মাঝপথে সে আশ্রয় নেয় একটি জনমানবশূন্য হাভেলিতে। তার বার বার মনে হতে থাকে এখানে সে আগে এসেছে। এমনকী তার হাতে আঁকা একটি ছবিও সেখানে রয়েয়ে। উন্মোচিত হয় গত জন্মের একটি ঘটনা। উগ্রনারায়ণের এই এস্টেটে সে এসেছিল ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে। তখন তার নাম আনন্দ। প্রেমে পড়েছিল একটি আদিবাসী মেয়ের, যার নাম মধুমতী। উগ্রনারায়ণেরও চোখ পড়ে তার দিকে। আনন্দকে কাজের ছুতোয় বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে উগ্র মধুমতীকে এনে তোলে প্রাসাদে। তার সতীত্ব নাশ করতে চায়। মধুমতী প্রাসাদের ছাদ থেকে লাভ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু তার আত্মা আনন্দের আশেপাশেই ঘুরতে থাকে। কখনও শোনা যায় তার গলা। কখনও দেখা যায় তার অবয়ব। আনন্দও জানতে পারে কী হয়েছে। সে উগ্রকে শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু তার অর্থ ও লোকবলের কাছে পেরে ওঠে না। দ্বিতীয়ত কোনও প্রমাণও নেই। উগ্র মধুমতীর ডেডবডি অবধি হাফিজ করে দিয়েছে। এস্টেটের জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে দেখা পায় মাধবীর, যে মধুমতীর বডি ডাবল। তার দাদা উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার। এরা জঙ্গলে এসেছিল পিকনিক করতে। সে এদের কাছে সাহায্য চায়। মাধবী যদি একদিন রাতে উগ্রর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তো সে ধরে নেবে এ মধুমতীর প্রেতাত্মা। তার দোষ কবুল করবে এবং অফিসার তাকে অ্যারেস্ট করবেন। কিন্তু সেদিন মাধবী আসার আগেই মধুমতীর আত্মা এসে হাজির হয়। ভয়ে উগ্র তার দোষ কবুল করে ফেলে, তার শাস্তি হয়। সেই আত্মার পিছু পিছু আনন্দ চলে যায় ছাদে এবং সেখান থেকে ঠিক সেই স্পটে পড়ে তারও মৃত্যু হয় যেখানে মধুমতী মরেছিল। এইভাবে তারা মরণের পরে মিলিত হয়, গল্প ফিরে আসে। এ জন্মে। দেবেন্দ্র গিয়ে পৌঁছোয় রেল স্টেশনে। আমরা অবাক হয়ে দেখি তার এ জন্মের স্ত্রীও অবিকল মধুমতীর মত দেখতে। অর্থাৎ তারা এজন্মেও আবার মিলিত হতে পেরেছে এবং তাদের ভারি ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে।

এরকম একটি আজগুবি অবিশ্বাস্য গল্পেও যে তিনি দর্শকের মন টেনে রাখতে পেরেছেন তার কারণ ছবিটির মেকিং। গল্প যতই আজগুবি হোক না কেন রোমান্টিক প্রেমের যে চিরন্তন আবহে তিনি ঢুকেতে চেয়েছেন সেখানে তিনি বহিরাগত নন। তা তিনি হৃদয় দিয়ে জানেন। ফলে ছবিটির মেকিং -এ একটি শান্ত সমাহিত কাব্যিক মেজাজ এসেছে। দুর্মূল্য সেই মেজাজটি গড়ে তুলতে তাঁকে সবচেয়ে সাহায্য করেছে ক্যামেরা এবং দিলীপকুমারের অভিনয়। দেবেন্দ্র এবং আনন্দ সবসময়ে যেন অবসেসড্ এবং কনফিউসড। লো কি অ্যাকটিং -এর এমন এক সূক্ষ্ম সুতোয় তিনি হেঁটেছেন যা একটু এদিক - ওদিক হলে হয় বাড়াবাড়ি হয়ে যায় নয় কিছু হয় না। পল মহেন্দ্রর সংলাপও তাকে প্রতি পদে সাহায্য করেছে। কলকাতা পর্যায়ে এই জিনিসটার অভাব ছিল যেটা আগে বলেছি। ক্যামেরার কাজ শুধু দেখতে ভাল এমন নয় তা যথাযথ মুডটিকে তৈরি করে দেয়। যেমন সুহানা সফর গানটির আগে একটা গাছের ডালপালার শট আসে যার রহস্যময়তা জাপানি পেইন্টিং -এর মতো। বিমল রায় একসময়ে ক্যামেরাম্যান ছিলেন সুতরাং মনে হতে পারে এমন কিছু শট তো তাঁর ছবিতে দেখা যাবেই। কিন্তু শুধু কারিকুরি দিয়ে অমন ইমেজারি আসে না, আসে অনুভব থেকে। সব বলা সম্ভব নয়। এরকম শট আরও আছে যা শুধু দেখনদারি নয়, শুধু ফাংশনাল নয়— এক একটা উন্মোচন।

একজন ফিল্ম মেকারকে শুধু তার ক্র্যাফট্টা জানালেই হয় না। তার সাবজেক্টটাকেও চিনে নিতে হয়। সুজাতার (১৯৫৯) গল্প সুবোধ ঘোষের। উপেন্দ্রনাথ পেশায় তার দায়িত্ব নেন। কিন্তু সে নিচু জাতের। নানা দ্বিধা সত্ত্বেও তাদের সংসারের একপাশে বাচ্চাটি জায়গা পায়। উপেনবাবুর মেয়ে রমা আর সুজাতা একসাথে বড় হতে থাকে। যথা সময়ে আসে অধীর নামে এক যুবক। উপেনের স্ত্রী চারু স্বপ্ন দেখে রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ে দেবে। কিন্তু অধীর আসক্ত সুজাতায়। সে যে অচ্ছুৎ কন্যা তার জানার পরও। কিন্তু চারু সুজাতার ওপর প্রচণ্ড রেগে যায়। যাকে সে ছোটবেলা থেকে প্রতিপালন করেছে এটা যেমন মনে হয় তার বিশ্বাসঘাতকতা। তাকে সে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে চায়। শেষমেষ একটি দুর্ঘটনার পর চারুর যখন রক্তের দরকার হয় তখন একমাত্র সুজাতার সঙ্গেই তার রক্ত মেলে। সুজাতার রক্তে সে জীবন ফিরে পায়। অধীর আর সুজাতার বিয়ে হয়ে যায়। এছবিতে বিমল রায় আরও পরিণত আরও স্থিতবী বিশেষ চরিত্রায়ণে। ভাল মানে শুধু ভাল, কালো মানে শুধু কালো, যাদের টাকা আছে তারাই খারাপ, যাদের টাকা নেই তারা সবাই ভাল এই সরলীকরণ সুজাতার নেই। অধিকাংশ মানুষ যে ভাল খারাপ, ঠিক বেঠিকের মাঝে দুলতে থাকে সেটা খুব সহজে এনে হাজির করেছে অচ্ছুৎ শিশুটিকে। একদিকে আনন্দ অনুষ্ঠান চলছে। অন্যদিকে বাইরে বসে কয়েকটি লোক আরেকটি বাচ্চাকে নিয়ে। অতিথিরা সব চলে গেলে উপেন্দ্র এবং চারুকে মুখোমুখি হতে হয় সেই মোক্ষম সিদ্ধান্তের— বাচ্চাটিকে নিয়ে তারা কী করবে। উপেন্দ্র কিছু টাকা দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়, কিন্তু চারুর যেহেতু ওই বয়সী একটি মেয়ে আছে তার মধ্যে মাতৃত্ব জেগে ওঠে। সেটাও সাধারণ হিন্দি ছবির মতো গ্যাদগ্যাদে মাতৃত্ব নয়। অবচেতনে খুব সূক্ষ্মভাবে কোথাও একটা তরঙ্গ ওঠে যার জন্য সে পরিচারিকাকে বলে বাচ্চাটিকে আপাতত সে রাখতে পারে কিনা। আপাতত নয় সে চিরতরেই থেকে যায়। উপেন্দ্র আর চারু এমন দোলায় পড়ে যায় যে তাকে বিদায় করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথমে সে পরিচারিকার কাজেই আউটহাউসে মানুষ হতে থাকে। কিন্তু একটি শিশু তো আর খেলার পুতুল নয়, তারও নিজস্ব কিছু চাহিদা থাকে, কখনও বায়না করতে করতে, কখনও খেলতে খেলতে সে আউটহাউস ছেড়ে এদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারপর একটি দৃশ্যে দেখি রমা বাবার পাত থেকে হালুয়া খেয়ে চলে যায়, দেখাদেখি লুজাতাও আসে। কিছু না ভেবে তাকেও উপেন্দ্র হালুয়া খাওয়ায়। কিন্তু সেই পাত থেকে এবার আর চারু স্বামীকে খেতে দেয় না। অথচ এই উপেন্দ্র প্রথমদিন বাচ্চাটিকে টাকা দিয়ে বিদেয় করেছিল আর চারু ঘরে তুলে নিয়েছিল। এসব পরিস্থিতিতে পুরুষ মানুষের বোধবুদ্ধি অনেক পরে উদয় হয় বরং মেয়েরা অনেক ইন্‌স্টিংটিভ হয়। আবার যখন অধীর রমার বদলে সুজাতাকে বিয়ে করতে চায় তখন নিজের মেয়ের হাত থেকে একটি সুপাত্র হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে রমা ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাকে বাড়িছাড়া করতে চায়। অর্থাৎ চারুর চরিত্রে অনেকগুলি লেয়ার— তার মধ্যে মাতৃত্ব আছে, কুসংস্কার আছে, আবার অন্ধ স্বার্থও আছে। কিন্তু সে মানুষ হিসেবে খারাপ নয়। মধ্যবিত্তের জগৎটা খুব নিগূঢ়ভাবে দেখা না থাকলে, কোথায় সে নিজেকে টপকাতে পারে আর কোথায় পারে না জানা না থাকলে এরকম চরিত্রায়ণ সম্ভব নয়।

চরিত্রায়ণের মতো ডিটেল এবং দৃশ্যায়নের নানা মুন্সিয়ানাতেও মুগ্ধ হতে হয়। সুজাতা এবং রমার পোষাকে, কথাবার্তায় সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে যাতে বোঝা যায় সে এ বাড়ির একজন হয়েও আশ্রিত। যেমন রমা মা, পিতাজি বলে সুজাতা বলে আম্মি,

আব্বু। একটি দৃশ্যে দুটি ঝাউ গাচের মাথা থেকে ক্যামেরা টিল্ট ডাউন হয়ে রমা আর সুজাতাকে ধরে, তারা তখন ঢেঁকি চড়ায় মত্ত। ঢেঁকির একটি প্রান্ত রমা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় সুজাতা হতচকিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতিতে দুটি গাছের মতো মানুষও সমান, ঢেঁকিতে দুজনের তুল্যমূল্য যাচাই এবং সুজাতার হঠাৎ পড়ে যাওয়ার মধ্যে অনেক লুকানো মন্তব্য রয়ে যায়। যারা এরমধ্যে ঢুকতে চান ঢুকতে পারেন, যারা না চান তাদেরও সহজ সরল মজা পেতে অসুবিধে নেই। বিমল রায়ের মেকিং -এ তেমন কোনও বাধ্যাবাধকতা নেই। উপেন্দ্রর বাড়ি সংলগ্ন একটি বড় বাগান আছে যেটি সুজাতাই পরিচর্যা করে। তার অনেকটা সময় এখানে কাটে। তার সাথে যে প্রকৃতির একটা সহজাত যোগ আছে সেটা আরও প্রকাশ পায় অধীর যখন সুজাতার প্রতি তার আকর্ষণের কথা বলে ফেলে। তখন তার যে পুলক জাগে সেটা বাড়িতে কাউকে সে বলতে পারে না। বললেই তুলকালাম হবে। অধীররকেও বলতে পারে না। কারণ তার ধারণা সে অচ্ছুৎ এটা জানলেই অধীর দূরে সরে যাবে। তখন সে সোট শুধু ভাগ করে নেয় গাছেদের সঙ্গে। অনবদ্য মিউজিকের সঙ্গে ফল, ফুল, পাতার কাঁপুনি ও বিভিন্ন শটস যেভাবে এসেছে তা পথের পাঁচালিতে বৃষ্টির আগে পুকুরে ফড়িং নাচানাচি, পদ্মপাতা উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। যে রাতে সুজাতা জানতে পারে সে অচ্ছুৎ সে রাতে ভীষণ বৃষ্টি নামে। এটা তার মানসিক আলোড়নের একটা বাহ্য ছবি। এই অব্দি ঠিক ছিল। কিন্তু যখন দেখা যায় বৃষ্টির সেই জলই একটি গান্ধী মূর্তির চোখ দিযে গড়িয়ে পড়ছে, তখন সেটা বড্ড লিটারাল এবং আক্ষরিক হয়ে যায় অনেকটা জলসাঘরের মদের গ্লাসে পোকা পড়ে যাওয়া বা খেলনার জাহাজ উল্টে যাওয়ার মতো।

বিমল রায় সেই যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ যার পোষাকি তকমা— গান্ধী নেহরুর যুগ। গান্ধীর চোখে জল বা শ্রমিক আন্দোলন নেমে যাওয়ার পর অনুপের পোষাক পুরো কংগ্রেসী সেবাদলের মতো হয়ে যাওয়ার মধ্যে এই রেশ ধরা পড়ে। যুগটার কাছে তাঁদের অনেক প্রত্যাশা ছিল হতাশাও ছিল। পরখ (১৯৫৯) ছবিতে ডেমোক্র্যাসি কিসে চলে— টাকার জোরে, গায়ের জোরে না মানুষের জোরে সেই প্রশ্ন তোলা হয়। রামামাধব গ্রামের পোস্টমাস্টারের কাছে পাঁচ লাখ টাকার একটা চেক এসে পৌঁছায়। সাথে একটি চিঠি গ্রামের সবচেয়ে সৎ এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যেন টাকাটা দেওয়া হয়। পোস্টমাস্টার ঠিক করেন ভোটের মাধ্যমে লোকেই ঠিক করুক কার এই টাকা পাওয়া উচিত। ব্যাস— জমিদার, চশমখোর ডাক্তার, পুজারী বামুন, পঞ্চায়েত প্রধান সবার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় মানুষকে তুষ্ট করার। কোন মানুষ? যাদেরকে দুদিন আগেও তারা ছলে বলে কৌশলে শোষণ করেছে। ঠিক যেমন ইলেকশনের আগে পলিটিক্যাল লিডাররা ভেক ধরে। ইলেকশনের দিন বিভিন্ন প্রতিযোগীদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের মধ্যে এমন মারামারি শুরু হয় যে ইলেকশন প্রক্রিয়াই বানচাল হওয়ার উপক্রম হয়। তখন যিনি টাকাটা দিয়েছেন সেই স্যার জগদীশ রায় এবং গ্রামবাসীরা মিলে ঠিক করে যে পোস্টমাস্টারের হাতেই টাকাটা তুলে দেওয়া হোক। যিনি নিজে খরচ না করে ওই চেক আগলে বসে আছেন তিনিই যোগ্য ব্যক্তি। গল্পে মারপ্যাঁচে একটা সমাধান বার করে দিলেও বিমল রায় নিজে জানতেন বাস্তবে এটা কোনও সমাধান নয়। আবার গল্পটা বা প্রশ্নটাকে ওপেন এন্ডড ছাড়তেও পারেন না। সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও তোলেন না। তিনি প্রতিবাদী মানুষ ছিলেন না। মানছি না মানব না বলার মতো মানসিকতা বা নিজেকে র‍্যাডিক্যাল প্রতিপন্ন করার দায় তাঁর ছিল না। তিনি সমালোচনা করেছেন, নেগেট করেননি। তাঁর আর্তি দর্শকের বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। তিনি সংস্কারক, বৈপ্লবিক নন। কারণ এই সমস্তটাই তাঁকে করতে হয়েছে মুম্বইতে বসে। তিনি ছিলেন মেইন স্ট্রিম ফিল্ম মেকার। মুম্বইতে আর কোনও স্ট্রিম তখন সম্ভব ছিল না। হলিউডেও একটা পর্যায় অবধি অলটারনেট সিনেমা বা যেটাকে ওরা বি-মুভিস বলে তা দাঁড়াতেই পারেনি। যাঁরা অন্য কিছু করতে চেয়েছেন, যেমন চ্যাপলিন বা হিচকক, তাঁদেরকে আগে কর্মাশিয়াল ভায়াবিলিটি প্রমাণ করতে হয়েছে। বিমল রায়ের ক্ষেত্রেও তাই হল। টাকা ঘোরাতে বিমল রায় প্রোডাকশন হয়ে উঠল একটি নির্ভরযোগ্য নাম। তখন তো ভারতীয় সিনেমার জগতে তিনটিই টাইটান যাঁদের নামে লোকে হলে চলে যেত— মেহবুব খান, শান্তারাম আর বিমল রায়। এই জায়গাটায় পৌঁছোতে তাকে কিছু জিনিস ছাড়তে হয়েছে, কিছু কমপ্রোমাইস করতে হয়েছে। দো বিঘা জমিনে একটা অলটারনেটিভ এনডিং তিনি শুট করে রেখেছিলেন যেখানে শম্ভুর স্ত্রী মারা যায়। বাণিজ্যিক কারণে সেটা ব্যবহার করেননি। পরখ -এর মতো বুদ্ধিদীপ্ত একটা গল্প, যেটা মিরাকেল ইন মিলানের মতোই এক্সপোসিশনে অবিশ্বাস্য কিন্তু কনক্লুশনে তীক্ষ্ণ হতে পারতো, তার মধ্যে নায়ক নায়িকার ভুল বোঝাবুঝির একটা ছেঁদো গল্প ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ক্যাপিটালের সঙ্গে চলতে হলে তার দাপটও মানতে হয়। সিংহের গুহায় বাস করলে হয় সিংহ হতে হয়, নয় সিংহ সেজে থাকতে হয়। বিমল রায় সম্পর্কেও সেই প্রশ্নটাই ওঠে তিনি কি ভারতীয় ছবির টাইটান বা টাইকুন। যাই হোক, শোনা যাচ্ছে পরিণীতা ছবিটি অচিরেই ডিভিডি হয়ে বাজারে আসছে। সেটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

১. Bimal Roy : A Film Maker's Perspective, Shyam Benegal The Man Who Spoke in Pictures Ed. Rinki Roy Bhattacharya Viking Penguin, 2009

২. কাহিনী ও তার রূপায়ন বিমল রায়

চলচ্চিত্রের চালচিত্র, সম্পাদক : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, সন্তু বসু

নন্দন পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র, ২০০০

এই রচনাটির লেখার সময় বিভন্ন তথ্য ও বিমল রায়ের ছবিগুলি সংগ্রহে সাহায্য করেছে অরিজিৎ মিত্র।